ইউনিট

৯ প্রাথমিক যুগের তুর্কী সালতানাত

ভূমিকা

মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ঘোর সাম্রাজ্যের সুলতান হন গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ। তিনি কুতুবউদ্দীন আইবেককে দাসত্ব থেকে মুক্তির ছাড়পত্র, রাজদন্ড এবং সুলতান উপাধি দান করেন। ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুতুবউদ্দিন, ইলতুতমিস, বলবন এবং তাঁদের বংশধরেরা শাসন করেন। প্রথম জীবনে কুতুবউদ্দীন, ইলতুতমিস এবং বলবন এই তিনজনই ছিলেন ক্রীতদাস। একসময় এঁদের সবাইকে একই বংশের লোক বলে মনে করা হতো, এবং তাঁদের বংশকে বলা হতো 'দাস বংশ'। কিন্তু আসলে এঁরা তিনজনই ছিলেন আলাদা আলাদা বংশের লোক। সিংহাসনে বসার আগে তাঁরা সবাই দাসত্ব থেকে মুক্তি পান। তাঁদের বংশধরগণ শাসকের সন্তান-সন্ততি হিসেবেই সিংহাসনে বসেন। তাঁরা না ছিলেন একই বংশের লোক, না তাঁরা কেউ সিংহাসনে বসার সময় ছিলেন দাস। সুতরাং তাঁদের বংশকে 'দাস বংশ' বলা সমীচীন নয়। তাঁদের শাসনামল ছিল দিল্লী সালতানাতের প্রাথমিক যুগ। আর তাঁরা সবাই ছিলেন জাতিতে তুর্কী। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাই তাঁদের শাসনামলকে "প্রাথমিক যুগে দিল্লীর তুর্কী সালতানাত" (The Early Turkish Sultanate of Delhi) বলে অভিহিত করেছেন। এই যুগে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দিল্লীর তুর্কী সালতানাত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগ ছিল সংহতির যুগ। এই যুগেই দিল্লী সালতানাতের শাসন-কাঠামো গড়ে ওঠে।

পাঠ ১

সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কুতুবউদ্দীন আইবেকের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সুলতান হিসেবে তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রাথমিক জীবন

কুতুবউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী। মুহম্মদ ঘোরী তাঁকে প্রথমে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন

কুতুবউদ্দীন জাতিতে তুর্কী। তাঁকে 'আইবেক' বলা হয়। তুর্কী ভাষায় আইবেক অর্থ চন্দ্রদেবতা। কেউ কেউ মনে করেন, হয়তো চন্দ্র গ্রহণের সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং এজন্য তাঁকে আইবেক বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ভাঙ্গা ছিল বলে তাঁকে এই নামে ডাকা হতো। খুব ছোটবেলায় একদল অপহরণকারী তাঁকে তাঁর পরিবার থেকে অপহরণ করে দাস হিসেবে বিক্রি করে। নিশাপুরের কাজী ফখরউদ্দীন তাকে কিনে নেন। কাজী তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা তাকে আবার এক বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। গজনীতে এই বণিকের কাছ থেকে মুহম্মদ ঘোরী তাঁকে কিনে নেন। কুতুবউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী। মুহম্মদ ঘোরী তাঁকে প্রথমে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন। শীঘ্রই তিনি নিজ যোগ্যতায় আমীর-ই-আখুর বা অশ্বারোহী বাহিনীর নায়ক হন। মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানে তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের পর তাঁকে ভারতীয় বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর চেষ্টায় হানসি, মীরাট, দিল্লী, রণথম্ভোর ও কুইল বিজিত হয়। মুহম্মদ ঘোরীর কনৌজ জয়ের সময় তিনি তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। এরপর কুতুবউদ্দীন গুজরাট, কালপি ইত্যাদি জয় করেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী সুলতান হন। তখনও তিনি কুতুবউদ্দীনকে ভারতীয় বিজিত অঞ্চলের শাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখেন। কুতুবউদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর পূর্ণ

আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। কুতুবউদ্দীনের অনুমতি নিয়ে বখতিয়ার খলজী বিহার জয় করেন। বখতিয়ার বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলও জয় করেন।

রাজনৈতিক জীবন

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হয়। তখন ঘোরের সিংহাসনে বসেন পরলোকগত সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দীন। নতুন সুলতান কুতুবউদ্দীনকে মুক্তির ছাড়পত্র, রাজছত্র ও রাজদন্ড প্রদান করেন। তিনি তাঁকে সুলতান উপাধিও দান করেন। সুতরাং ১২০৬ খ্রিঃ স্বাধীন দিল্লী সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং কুতুবউদ্দীনই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

কুতুবউদ্দীন ছিলেন ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

এদিক থেকে কুতুবউদ্দীনের কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনি কয়েকটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। তিনি গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইয়ালদুজের কন্যাকে বিয়ে করেন। বোনের বিয়ে দেন সিন্ধু সুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কুবাচার সাথে এবং নিজ কন্যার বিয়ে দেন ইলতুতমিসের সাথে। কিন্তু ইয়ালদুজের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। ইয়ালদুজ লাহোর দখল করেন। বাধ্য হয়ে কুতুবউদ্দীন তাঁর সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে ইয়ালদুজ পরাজিত হন। কুতুবউদ্দীন গজনী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু দিল্লীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাঁকে দিল্লীতে ফিরে আসতে হয়। তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ আবার গজনী দখল করেন। ভারতে অবশ্য কুতুবউদ্দীনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন করা হয়। এদুটি সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কুতুবউদ্দীন ছিলেন ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১২১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চৌগান (এক ধরনের পোলো খেলা) খেলতে গিয়ে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে লাহোরে সমাধিস্থ করা হয়।

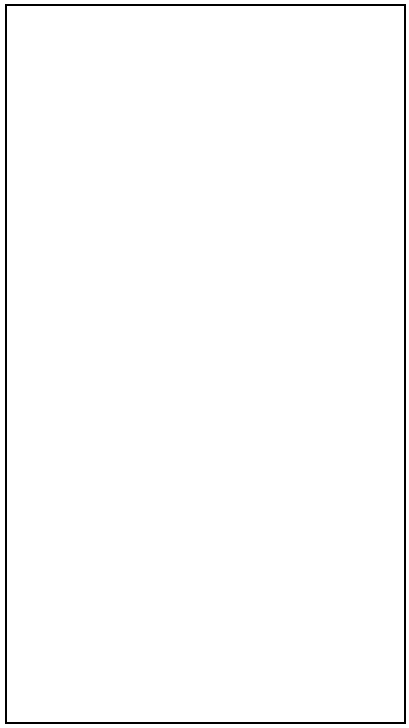

কুতুবমিনার

কুতুবউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

কুতুবউদ্দীন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান। মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। সুলতান হওয়ার পর অবশ্য তিনি আর কোন নতুন অঞ্চল জয় করতে পারেন নি। তবে পূর্ব অধিকৃত অঞ্চলে তিনি শান্তি কায়েম করতে সক্ষম হন। তিনি সুশাসন প্রবর্তন করেন। বলা হয় তাঁর কঠোর শাসনে মেষ ও নেকড়ে বাঘ একঘাটে পানি পান করতো। দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না বললেই চলে। নব বিজিত দেশে এ'রকম আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কুতুবউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তাঁকে 'লাখ-বখ্শ' বলা হতো। বিখ্যাত দাতা হাতেম তাঈ-র সাথে তাঁকে তুলনা করা হতো। তিনি ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় কারণে কোন হিন্দুকে তিনি উৎপীড়ণ করেন নি। তিনি বহু হিন্দুকে রাজকাজে নিয়োগ করেন। জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর দ্বারা সমাদৃত হতো। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর "কুয়ত-উল-ইসলাম" এবং আজমীরের "আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া" নামক মসজিদ দুটি তাঁর শাসনামলে নির্মিত হয়। বিখ্যাত কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজও তাঁর সময়ই শুরু হয়। যদিও এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় তাঁর জামাতা ইলতুতমিসের শাসনামলে।

বলা হয় তাঁর কঠোর শাসনে মেষ ও নেকড়ে বাঘ একঘাটে পানি পান করতো

সার-সংক্ষেপ

কুতুবউদ্দীন আইবেক ছিলেন মুহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। নিজগুণে তিনি সেনাপতি পদে উন্নীত হন। তরাইনের যুদ্ধ জয়ের পর ঘোরী তাঁকে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দীন এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। তিনি নিজেও মীরাট, দিল্লী, রণথম্ভোর প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। ঘোরীর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন সুলতান হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। প্রাথমিক পর্যায়ের নানা আপদ-বিপদ থেকে তিনি দিল্লী সালতানাতকে রক্ষা করেন। তাঁর চেষ্টায় দিল্লী সালতানাত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন ভারতে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুশাসক ছিলেন। ন্যায় বিচারের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ফখরউদ্দীন কাজী ছিলেন–
ক. নিশাপুরের।
খ. ঘোরের।
গ. গজনীর।
ঘ. লাহোরের।

২। মুহম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দীনকে ক্রয় করেন–
ক. লাহোরে।
খ. ঘোরে।
গ. গজনীতে।
ঘ. নিশাপুরে।

৩। মুহম্মদ ঘোরী সুলতান হন–
ক. ১১৯২ সালে।
খ. ১২০৩ সালে।
গ. ১২০৬ সালে।
ঘ. ১২১০ সালে।

৪। স্বাধীন দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক. ১২০০ সালে।
খ. ১২০২ সালে।
গ. ১২০৪ সালে।
ঘ. ১২০৬ সালে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কুতুবউদ্দীনের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. শাসক হিসেবে কুতুবউদ্দীনের মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ২

সুলতান ইলতুতমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ইলতুতমিসের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইলতুতমিস কিভাবে দিল্লী সালতানাতের সংহতি সাধন করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাথমিক জীবন

ইলতুতমিস ছিলেন ইলবারী তুর্কী গোষ্ঠির লোক। তিনি যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান, তেমনি ছিলেন দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী। এজন্য তাঁর ভাইয়েরা ছিল তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তারা তাঁকে একজন দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই দাস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বোখারার প্রধান কাজী তাঁকে কিনে নেন। কাজী ইলতুতমিসের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কাজীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ইলতুতমিসকে বিক্রি করে দেয়। ইলতুতমিসের নতুন মনিব হলেন জালালউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি। এই জালালের কাছ থেকে কুতুবউদ্দীন আইবেক ইলতুতমিসকে উচ্চমূল্যে কিনে নেন। ইলতুতমিসের গুণে কুতুবউদ্দীন অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন, বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং নিজ কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ দিল্লীর সুলতান হন। কুতুবউদ্দীনের সাথে আরাম শাহের সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আরাম শাহ ছিলেন কুতুবউদ্দীনের পুত্র। কিন্তু মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, কুতুবউদ্দীনের কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। তাঁর শুধু তিন জন কন্যা ছিলেন বলে মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজলের মতে, আরাম শাহ ছিলেন কুতুবউদ্দীনের ভাই। আবার কেউ কেউ বলেন, কুতুউদ্দীনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিলনা। প্রয়োজনের সময় তাঁকে হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছিল এবং তাঁকে সুলতান পদে বরণ করা হয়েছিল।

সিংহাসনারোহণ

কিন্তু আরাম শাহ শাসক হিসেবে একেবারেই অযোগ্য প্রমাণিত হন। দিল্লীর আমীরগণ তাই কুতুবউদ্দীনের জামাতা ও বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুতমিসকে সুলতান পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। ইলতুতমিস রাজী হন। দিল্লীর অদূরে আরাম শাহের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিস দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজকীয় উপাধি হয় সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুতমিস।

ইলতুতমিস চার দিকের বিপদ কাটিয়ে দিল্লী সালতানাতের সংহতি স্থাপন করেন

সিংহাসনে বসার পর ইলতুতমিস দেখতে পেলেন যে তাঁর চার দিকে বিপদ। গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ, ও সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কুবাচা, তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। বাংলার শাসনকর্তা আলী মর্দান খলজীও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমীরদের মধ্যে রেষারেষী ছিল। তাঁরা ছিলেন তিনভাগে বিভক্ত। মুহম্মদ ঘোরীর আমলের আমীরগণ "মুইজ্জী আমীর" (ঘোরের সিংহাসনে বসার পর মুহম্মদ ঘোরী "মুইজউদ্দীন মুহম্মদ বিন-সাম" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন বলে), কুতুবউদ্দীনের আমলের আমীরগণ "কুত্‌বী আমীর" এবং ইলতুতমিসের আমলের আমীরগণ "শামসী আমীর" নামে অভিহিত হতেন। কুত্‌বী আমীরগণ ইলতুতমিসকে সমকক্ষ এবং মুইজ্জী আমীরগণ তাঁকে তাঁদের চেয়ে হেয় গণ্য করতেন। যাহোক, ইলতুতমিস বিদ্রোহী আমীরদের জুদের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং নিজের অবস্থান মজবুত করেন। ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইয়ালদুজকে তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি কুবাচাকেও পরাজিত করেন। ঠিক এই সময় আর একটা ভয়াবহ বিপদ আসে মধ্য এশিয়ার দিক থেকে। দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খান সমগ্র মধ্য এশিয়া পদানত করেন। খাওয়ারিজমের শাহ তাঁর নিকট পরাজিত হন। শাহের পুত্র জালাল ইলতুতমিসের কাছে আশ্রয় চান। ইলতুতমিস পড়লেন উভয় সঙ্কটে। আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় না দিলে রাজধর্ম রক্ষা হয় না। অপরদিকে আশ্রয় দিলে চেঙ্গিসের কোপানলে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিলেন। তিনি জালালকে বলে পাঠালেন যে ভারতের আবহাওয়া তাঁর জন্য তেমন সুখকর হবে না, সুতরাং তিনি যেন অন্যত্র আশ্রয় খুঁজে নেন। বাধ্য হয়ে জালালকে ভারত ত্যাগ করতে হয়। তবে যাওয়ার আগে তিনি লাহোর, মুলতান ইত্যাদি অঞ্চল লুট করে যান। এতে সর্বাপেক্ষা

ক্ষতিগ্রস্থ হন ইলতুতমিসের শত্রু কুবাচা। জালালের পর পরই চেঙ্গিস ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হন। ইলতুতমিস তাঁকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। এ ভাবে সমূহ বিপদ থেকে ভারত রক্ষা পেল।

বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করেন

ইলতুতমিস অত:পর বাংলার দিকে নজর দেন। বাংলায় তখন ইওয়াজ খলজীর কর্তৃত্ব। আলী মর্দানকে পরাজিত ও নিহত করে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী ১২১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি "সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী" এই রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং 'খুতবায়' তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। এ সবই রাজকীয় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতিপত্র লাভ করে তিনি ইলতুতমিসের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নিজেই ইওয়াজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ইওয়াজ ক্ষমা ভিক্ষা করে রেহাই পান। সুলতান তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। কিন্তু সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসা মাত্র ইওয়াজ খলজী দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তাঁকে দমন করার জন্য সুলতান তাঁর বড় ছেলে নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে পাঠান। ইওয়াজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১২২৭ খ্রি:)। বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হলো।

সিন্ধু ও মুলতানের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়

সাম্রাজ্যের পশ্চিম এলাকাও ইলতুতমিসের নিয়ন্ত্রণে আসে। ইয়ালদুজের মৃত্যুর পর লাহোরের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকী ছিল সিন্ধু ও মুলতান ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিস নাসিরউদ্দীন কুবাচাকে বাক্কারের যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত করেন। সিন্ধু নদ পার হতে গিয়ে কুবাচা মারা যান। সিন্ধু ও মুলতানের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিস বাগ্‌দাদের খলিফার কাছ থেকে "সুলতান-উল-আজম" খেতাব এবং রাজছত্র ও রাজকীয় পোষাক উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন। এতে তাঁর গৌরব অনেক বেড়ে যায়।

ইলতুতমিস হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ দমন করেন

নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে একে দমন করার পর ইলতুতমিস হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রণথম্ভোর পুনর্দখল করেন। গোয়ালিয়রও তাঁর দখলে আসে। মালবের ভিলসা এবং উজ্জয়িনীও তিনি জয় করেন। ইলতুতমিস অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাথমিক তুর্কী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পঁচিশ বছর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসন করার পর ১২৩৬ খ্রি: তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইলতুতমিস অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন

সার-সংক্ষেপ

ইলতুতমিস দাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। নানা প্রভুর হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি কুতুবউদ্দীনের অধীনে আসেন। কুতুবউদ্দীন তাঁর গুণে মুগ্ধ হন। তাঁকে আজাদ করে সুলতান তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেন এবং তাঁকে বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ সুলতান হন। আমীরদের অনুরোধে অযোগ্য আরামকে পরাজিত করে ইলতুতমিস সিংহাসনে বসেন। তিনি নব-গঠিত দিল্লী সালতানাতকে নানা আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি ইয়ালদুজ, কুবাচা ও ইওয়াজের বিরোধিতা নির্মূল করেন। এর ফলে লাহোর, সিন্ধু-মুলতান এবং বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কৌশলে চেঙ্গিস খানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করেন। বিদ্রোহী হিন্দু রাজাদের দমন করে তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁকে দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইলতুতমিস লোক ছিলেন–
   ক. ইলবারি তুর্কী গোষ্ঠির।
   খ. খলজী তুর্কী গোষ্ঠির।
   গ. পাঠান গোষ্ঠির।
   ঘ. দাস গোষ্ঠির।

২। কুতুবউদ্দিন ইলতুতমিসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন–
ক. গজনীর।
খ. লাহোরের।
গ. বদায়ুনের।
ঘ. মুলতানের।

৩। ইলতুতমিসের আমলের আমীরগণকে বলা হতো–
ক. মুইজ্জী আমীর।
খ. শামসী আমীর।
গ. কুত্‌বী আমীর।
ঘ. হিন্দুস্থানী আমীর।

৪। ইলতুতমিস বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে সুলতান-উল-আজম খেতাব পান–
ক. ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১২২১ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ইলতুতমিসের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে টীকা লিখুন।

২. ইলতুতমিস কিভাবে বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন–

পাঠ ৩

ইলতুতমিশের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- শাসক হিসেবে ইলতুতমিসের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ইলতুতমিসের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

শাসক হিসেবে ইলতুতমিশের কৃতিত্ব মূল্যায়ন

১২০১ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্ব ইতিহাসে ইলতুতমিস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি দিল্লী সালতানাতের সংহতি বিধান করেন। তিনি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন দিল্লী সালতানাতের বড় দুর্দিন, চারদিকে এর বিপদ। তিনি ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে একের পর এক এই সকল বিপদ কাটিয়ে উঠেন। তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দীন কুবাচা ছিলেন ইলতুতমিসের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাঁরা দুজনেই নিজেদেরকে ইলতুতমিস অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বলে দাবি করতেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মুইজ্জী অভিজাত। অপরদিকে ইলতুতমিস ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ের কুত্‌বী অভিজাত। দুজনেই ঘোষণা করেন যে দিল্লী সালতানাতের উপর তাঁদের দাবি ইলতুতমিসের দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। তাঁদের দুজনের প্রতিই যথেষ্ঠ সমর্থন ছিল। দুজনেরই সৈন্যবল ও অর্থবল ছিল প্রচুর। এমতাবস্থায় অপূর্ব দৃঢ়তা, মনোবল ও শক্তি-সাহস নিয়ে তিনি এই প্রবল শত্রুদ্বয়ের মোকাবেলা করেন। ইলতুতমিস অপেক্ষা কম গুণাবলীর অধিকারী যে কোন শাসক এ অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়তেন। কূট-কৌশলে তিনি চেংগিস খানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতীয় জনগণের মান-সম্মান, জীবন ও ধন-সম্পদ রক্ষা করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের পরিচয় দেন তা তাঁকে একজন প্রজ্ঞাবান সুলতান হিসেবেই আমাদের কাছে তুলে ধরে। সেদিন তিনি জালাল শাহকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার না করলে ভারতের উপর কোন দুর্বিপাক নেমে আসতো তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

প্রখর মেধাসম্পন্ন সুলতান এক সাথে সকল শত্রুর মোকাবেলা করেন নি। প্রথমে একজন শত্রুকে তিনি বেছে নেন। তাকে নিষ্ক্রিয় করার পর পরবর্তী করণীয় বাছাই করেন। বিষয়টি তাঁকে বাস্তব রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইয়ালদুজ ও চেংগিসের পক্ষ থেকে নিজেকে নিষ্কন্টক করার পরই তিনি বাংলার গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীর মুখোমুখি হন, তার আগে নয়। যে শত্রুকে তিনি সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মনে করতেন তাকেই তিনি প্রথম আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি শুধু তাঁর পূর্বসূরীর রাজ্য রক্ষাই করেন নি, এর বিস্তৃতিও ঘটান। তিনি সিন্ধু ও মালব দিল্লী সালতানাতের অন্ত র্ভুক্ত করেন। তাছাড়া বিদ্রোহী হিন্দু রাজন্যবর্গকে দমন করে তাদেরকে দিল্লীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেন।

প্রতিপক্ষের প্রতি তার আচরণ

১২১১ থেকে ১২৩৬ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি শাসন করেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন-যাপন করেছেন। প্রায় সারাক্ষণই তাঁকে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন নি। শত্রুদের সাথে মোকাবেলায় তিনি বাইরের কোন শক্তির সাহায্য বা সহযোগিতা পান নি। তিনি যা কিছু সাধন করেছেন নিজের চেষ্টাতেই করেছেন। তিনি ছিলেন অসীম মনোবলের অধিকারী। কোন বিপদের ভয়াবহতাই তাঁকে তা দলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি।

শত্রু দমন ও সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানের সাথে সাথে ইলতুতমিস দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শাসন-কাঠামোও গড়ে তোলেন। কুতুবউদ্দীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় সময় পান নি। ইলতুতমিসই প্রথম ভারতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের উপর তিনি কড়া নজর রাখতেন। সুলতানের সতর্ক দৃষ্টির জন্য কর্মকর্তাগণ কাজে-কর্মে অমনোযোগী কিংবা বেহিসাবী হওয়ার সুযোগ পেতো না। মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এদেশে মুদ্রা ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করেন। আরবি মুদ্রার অনুকরণে তিনি ভারতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর মুদ্রাগুলি ছিল নিখুঁত ওজন ও সাইজের। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত সুনির্দিষ্ট করে তিনি রাজস্ব শাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিতকরণ করে তিনি চমৎকার সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেন।

শত্রু দমন ও সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানের সাথে সাথে ইলতুতমিস দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শাসন-কাঠামোও গড়ে তোলেন

ইলতুতমিস নির্মাতা হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ঠ উৎসাহী

ইলতুতমিস নির্মাতা হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ঠ উৎসাহী। কুয়ত-উল-ইসলাম মসজিদ ও কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ কুতুবউদ্দীন শেষ করে যেতে পারেন নি। ইলতুতমিসের উদ্যোগে এ দুটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। তিনি জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের কারণে মধ্য এশিয়ার বহু পন্ডিত ব্যক্তি গৃহহারা ও অসহায় হয়ে পড়েন। ইলতুতমিসের দরবার ছিল তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ইলতুতমিস এই সকল পন্ডিতের ভরণ-পোষণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। এতে সুলতানের সুনাম ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ন্যায় বিচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাগদাদের খলিফা তাঁকে সুলতান-উল-আজম খেতাব এবং মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। এতে সুলতানের গৌরব যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পায়। তিনি যথার্থই এই গৌরবের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ তাঁকে দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। ইলতুতমিস ছিলেন প্রাথমিক তুর্কী সালতানাতের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর প্রথম জীবন ছিল ভাগ্যবিড়ম্বিত। আপন চারিত্রিক গুণাবলীর জন্যই তিনি দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

ইলতুতমিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী সুলতান ছিলেন। তিনি একে একে সালতানাতের সকল শত্রুকে দমন করেন। তাঁর চেষ্টায় প্রাথমিক দিল্লী সালতানাত সকল আপদ-বিপদ কাটিয়ে উঠে। তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এর সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। তিনি ন্যায়-বিচারক ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লী সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইলতুতমিস দিল্লীর সুলতান ছিলেন–
- ক. দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।
- খ. দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।
- গ. ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।
- ঘ. ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

২। ইলতুতমিস দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন–
- ক. সিন্ধু ও মালব।
- খ. গুজরাট ও রাজপুতনা।
- গ. গজনী ও ঘোর।
- ঘ. বিহার ও উড়িষ্যা।

৩। ইলতুতমিস রাজত্ব করেন–
- ক. ২২ বছর।
- খ. ২৩ বছর।
- গ. ২৪ বছর।
- ঘ. ২৫ বছর।

৪। ভারতে সর্বপ্রথম মুসলিম মুদ্রা চালু করেন–
- ক. কুতুবউদ্দীন আইবক।
- খ. শামসউদ্দীন ইলতুতমিস।
- গ. আলাউদ্দীন খলজী।
- ঘ. মুহম্মদ বিন-তুঘলক।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতান হিসেবে ইলতুতমিসের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
২. ইলতুতমিসের চারিত্রিক গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ ৪

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কি পরিস্থিতিতে রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুলতানা রাজিয়া কিভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- রাজিয়ার বিরুদ্ধে আমীরদের বিদ্রোহ এবং তাঁর ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সুলতানা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন দান

ইলতুতমিসের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল নাসিরউদ্দীন মাহমুদ। তিনি ছিলেন সকল গুণে গুণান্বিত। তিনি পিতার হয়ে বাংলার বিদ্রোহী শাসক গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর মাহমুদ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুলতান তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে কনিষ্ঠপুত্রেরও নাম রাখেন নাসিরউদ্দীন মাহমুদ। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিসের যখন মৃত্যু হয় তখন এই নাসিরউদ্দীন ছিলেন নিতান্তই নাবালক। ইলতুতমিসের অপর পুত্রগণ সবাই ছিলেন অপদার্থ এবং সুলতান হওয়ার অযোগ্য। তাঁর একমাত্র কন্যা রাজিয়া যেমন ছিলেন রূপবতী তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও সাহসী। সুলতান তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজিয়া পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে উঠেন। তাই সুলতান মৃত্যু শয্যায় কন্যা রাজিয়াকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

সুলতানা রাজিয়া আমীরদের অসন্তোষের মধ্য দিয়ে ক্ষমতারোহণ করেন

কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর পর আমীরগণ তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি কোন সম্মান দেখালেন না। নারী হওয়ার কারণে রাজিয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিলেন সুলতান হওয়ার অনুপযুক্ত। তাই তারা ইলতুতমিসের পুত্র (জীবিতদের মধ্যে জেষ্ঠ) রুকুনউদ্দীন ফিরোজকে সিংহাসনে বসালেন। এই সময় ইলতুতমিসের কয়েকজন ক্রীতদাস খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তারা "বন্দেগান-ই-চেহেলগান" বা বিখ্যাত চল্লিশ নামে পরিচিত। কাউকে সুলতান বানানো কিংবা সুলতান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কর্তৃত্ব তাদের উপর বর্তেছিল। এই আমীরদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন "King makers and king breakers"। যাহোক শিগগিরই রুকুনউদ্দীন ফিরোজ শাসক হিসেবে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তখন আমীরগণ রাজিয়াকেই দিল্লীর সিংহাসনে বসান।

রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল

সিংহাসনে বসে রাজিয়া সাহসিকতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু অচিরেই কয়েকজন আমীর ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলতে অস্বীকার করলেন। প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ জুনাইদী এঁদের নেতৃত্ব দেন। তারা রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল সৃষ্টি করলেন। নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলো। দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলো। রাজিয়া অপূর্ব দক্ষতার সাথে এই সকল বিদ্রোহ দমন করলেন। এ প্রসংগে ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, "লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবল ও দামরিলা পর্যন্ত সমগ্র দেশের মালিক ও আমীরগণ তাঁর আনুগত্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেন।" দেশে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলো।

রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে সুলতানা রাজিয়া স্বাভাবিক কারণেই নিজেকে পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ রাখতে পারতেন না। তাঁকে প্রকাশ্য দরবারে উপবেশন করতে হতো। দরবারে বসার সময় তিনি পুরুষের পোষাক পরিধান করতেন। কোমরে ঝোলাতেন কোষবদ্ধ তরবারি। তাঁর এই আচরণ ক্রমেই দরবারের আমীরদের মধ্যে গুঞ্জরণের সৃষ্টি করে। ঠিক এই সময় সুলতানা উচ্চ রাজপদে জালালউদ্দীন ইয়াকুত নামে একজন হাবসীকে নিয়োগ করেন। এতে আমীরদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায়। তখন গুঞ্জরণ প্রতিবাদে পর্যবসিত হয়। ভাতিন্দার শাসনকর্তা ছিলেন ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া। সুলতানার বিরুদ্ধে আলতুনিয়া একটা বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। রাজিয়া বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং আলতুনিয়ার হাতে বন্দী হন। রাজ্যের অন্যান্য আমীরগণ রাজিয়ার আর এক ভাই বাহরাম শাহ্‌কে সিংহাসনে বসান। এতে আলতুনিয়ার সম্মতি ছিল না। তিনি রাজিয়ার পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন। উভয়ে সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁরা বাহরামের সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তাঁরা

একটা গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় একজন হিন্দু আততায়ী তাঁদের দুজনকেই হত্যা করে।

কৃতিত্ব মূল্যায়ন

রাজিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। নারীরা অক্ষম, নারীরা দুর্বল এই ধারণাকে তিনি মিথ্যা প্রমাণিত করেন। ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চার বছর তিনি শাসন করেন। এই চার বছর কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দক্ষ নাবিকের মতো তিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেন নি। তাঁর এই ব্যর্থতার জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। দায়ী ছিল তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর "তাবাকাৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থে রাজিয়াকে একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান, জ্ঞানী, ন্যায়বতী, মহানুভবা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাদের রক্ষাকত্রী ও সেনাবাহিনীর দক্ষ পরিচালিকারূপে চিত্রিত করেছেন। রাজিয়ার চরিত্রে সত্যিই এসকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি কর্তব্যে অটল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পটু ছিলেন। তিনি একদিকে ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন, অপরদিকে তিনি বিদূষী মহিলা ছিলেন। তিনি গুণের সমাদর করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। জালালউদ্দীন ইয়াকুতের উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন নারী হয়ে জন্মেছিলেন। ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার কারণে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডল তাঁর যোগ্য সমাদর করতে ব্যর্থ হয়। তবুও উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

রাজিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। নারীরা অক্ষম, নারীরা দুর্বল এই ধারণাকে তিনি মিথ্যা প্রমাণিত করেন

সার-সংক্ষেপ

মৃত্যুশয্যায় ইলতুতমিস কন্যা রাজিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু আমীরগণ ইলতুতমিসের পুত্র রুকুনউদ্দীন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। ফিরোজের অযোগ্যতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজিয়াকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রধানমন্ত্রী জুনাইদীর নেতৃত্বে রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজিয়া এই বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু কতগুলো কারণে ভাতিন্দার শাসনকর্তা আলতুনিয়ার নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে রাজিয়া পরাজিত ও আলতুনিয়ার হাতে বন্দী হন। আমীরগণ ইলতুতমিসের অপর পুত্র বাহরাম শাহকে সিংহাসনে বসান। আলতুনিয়া এর বিরোধিতা করে রাজিয়ার পক্ষে যোগ দেন। তিনি রাজিয়াকে বিয়ে করেন। উভয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু বাহরাম শাহের সৈন্যদের নিকট তারা পরাজিত হন। পালিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক আততায়ীর হাতে তারা নিহত হন। রাজিয়া প্রায় চার বছর শাসন করেন। তিনি গুণবতী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইলতুতমিসের জেষ্ঠপুত্রের নাম–
   ক. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ।
   খ. রুকুনউদ্দীন ফিরোজ।
   গ. ইখতিয়ার উদ্দীন আলতুনিয়া।
   ঘ. গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ।

২। ইলতুতমিসের কনিষ্ঠপুত্রের নাম ছিল–
   ক. রুকুনউদ্দীন ফিরোজ।
   খ. গিয়াসউদ্দীন বলবন।
   গ. আলাউদ্দীন মাসুদ।
   ঘ. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ।

৩। রাজিয়ার শাসনামলে ভাতিন্দার শাসনকর্তা ছিলেন–

ক. মুহম্মদ জুনাইদী।
খ. ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া।
গ. বাহরাম শাহ।
ঘ. আলাউদ্দীন মাসুদ।

৪। রাজিয়া নিহত হন–
ক. ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসন লাভ বর্ণনা করুন।
২. সুলতানা রাজিয়া যেভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ ৫

সুলতান নাসিরউদ্দীন (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- শাসক হিসেবে সুলতান নাসিরউদ্দীনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- সুলতান নাসিরউদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শাসক হিসেবে সুলতান নাসিরউদ্দীন

পূববর্তী পাঠে আমরা জেনেছি যে আমীরগণ রাজিয়ার পরিবর্তে বাহরাম শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। বাহরামশাহ ১২৪০ থেকে ১২৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত মাত্র দু'বছর শাসন করেন। এরপর আমীরগণ বাহরাম শাহকে সুলতানের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং দিল্লীর শ্বেতদুর্গে অবরুদ্ধ করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা হয়। তারা রুকুনউদ্দীনের পুত্র আলাউদ্দীন মাসুদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। কিন্তু মাসুদ ছিলেন বাহরাম শাহ অপেক্ষাও দুর্বল প্রকৃতির। ১২৪২ থেকে ১২৪৬ খ্রিঃ পর্যন্ত চার বছর শাসন করার পর মাসুদ শাহকেও সিংহাসনচ্যুত করা হয়। এরপর আমীরগণ সিংহাসনে বসান ইলতুতমিসের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে। নাসিরউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। রাজ্য পরিচালনার জন্য শাসকগণকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কূট-কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু নাসিরউদ্দীন এসব মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি দরবেশের ন্যায় পবিত্র ও নিরুপদ্রব জীবন-যাপন করতেন। তাই তিনি রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব গিয়াসউদ্দীন বলবনের হাতে ছেড়ে দেন। বলবন ছিলেন ইলতুতমিসের চল্লিশ ওমরাহর অন্যতম। নাসিরউদ্দীন তাঁকে 'উলুঘ খান' উপাধি দেন। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে বলবনের কন্যার সাথে সুলতানের বিয়ে হয়। নাসিরউদ্দীন বলবনের উপর যে আস্থা স্থাপন করেন বলবন তার মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন।

রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব গিয়াসউদ্দীন বলবনের হাতে ছেড়ে দেন। বলবন ছিলেন ইলতুতমিসের চল্লিশ ওমরাহর অন্যতম

বলবনের ভূমিকা

বলবন সুলতানের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় তিনি যোগ্য লোক নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। কোন কিছুই তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াতো না। সামান্যতম অপরাধ করলেও অপরাধীকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। এতে কিছু লোক তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। বিশিষ্ট তুর্কী নেতা ইমাদউদ্দীন রায়হান ছিলেন এসকল অসন্তুষ্ট লোকদের মধ্যে একজন। তিনি সুলতানের নিকট বলবনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। একথা সত্য যে, বলবন কিছু কিছু পদে নিজের আত্মীয়-স্বজন বসিয়েছিলেন। যেমন, তিনি তাঁর চাচাত ভাই শেরখানকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তবে এসকল নিয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়েছিল, স্বজনপ্রীতির জন্য নয়। যাহোক, অভিযোগের ভিত্তিতে সুলতান বলবনকে পদচ্যুত করেন। সুলতান কর্তৃক বলবনের পদচ্যুতি প্রমাণ করে যে, সুলতান ক্ষমতাহীন ছিলেন না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং প্রয়োজনে সেরকম সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন। বলবনকে পদচ্যুত করে সুলতান সে পদে ইমাদউদ্দীনকে বসান। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইমাদউদ্দীনের ঔদ্ধত্যে তুর্কী প্রধানগণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে বলবনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সুলতান তখন বলবনকে তাঁর পদে সসম্মানে পুনর্বহাল করেন।

বলবন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা কুতলু খান বলবনের আচরণে রুষ্ট হন। তিনি বিদ্রোহ করেন। বলবন এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। বলবনের কঠোর শাসনে নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকাল শান্তিতেই কাটে। এই সময় মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি ছিল। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, নাসিরউদ্দীন যখন দিল্লীর সুলতান সে সময়েই মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করেন (১২৫৮ খ্রিঃ)। বিশ বছর শান্তিতে রাজত্ব করার পর ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দীনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই তিনি মৃত্যুকালে তাঁর শ্বশুর বলবনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ অত্যন্ত সদয় ও হৃদয়বান সুলতান ছিলেন। তিনি গরীব-দুঃখীর খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের সাহায্য করতেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ তার সময় দিল্লীর কাজী ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ " তাবাকাৎ-ই-নাসিরী" সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। মিনহাজ নাসিরউদ্দীনের পবিত্র জীবন-যাপনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সুলতান কোরআন নকল এবং টুপী সেলাই করে যে অর্থ পেতেন তাই দিয়ে তাঁর ভরণ-পোষণ করতেন। রাজকোষ থেকে কোন অর্থ তিনি সংসারের প্রয়োজনে গ্রহণ করতেন না। তিনি এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এরকম পবিত্র চরিত্রের অধিকারী শাসক মধ্যযুগের বিশ্ব ইতিহাসে খুবই বিরল।

সার-সংক্ষেপ

রাজিয়ার পর বাহরাম শাহ এবং বাহরাম শাহের পর আলাউদ্দীন মাসুদ দিল্লীর সুলতান হন। এরা দুজনেই ছিলেন সুলতান হওয়ার অযোগ্য। আমীরগণ তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করে ইলতুতমিসের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে সিংহাসনে বসান। নাসিরউদ্দীন ১২৪৬ থেকে ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নাসিরউদ্দীন ছিলেন ধার্মীক প্রকৃতির লোক। তাঁর হয়ে রাজ্যশাসন করতেন গিয়াসউদ্দীন বলবন। ২০ বছর শান্তিতে শাসন করার পর নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয় ও প্রজারঞ্জক সুলতান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। রাজিয়ার পর দিল্লীর সুলতান হন–
- ক. বাহরাম শাহ।
- খ. আলাউদ্দীন মাসুদ।
- গ. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ।
- ঘ. গিয়াসউদ্দীন বলবন।

২। বলবন ছিলেন–
- ক. অত্যন্ত সদাশয়।
- খ. অত্যন্ত কলহপ্রিয়।
- গ. অত্যন্ত কঠোর।
- ঘ. অত্যন্ত আমোদপ্রিয়।

৩। হালাকুখান বাগদাদ ধ্বংস করেন–
- ক. ১২৫৬ সালে।
- খ. ১২৫৮ সালে।
- গ. ১২৬০ সালে।
- ঘ. ১২৬২ সালে।

৪। 'তাবাকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের রচয়িতা–
- ক. জিয়াউদ্দীন বারণী।
- খ. আবুল ফজল।
- গ. শামস-ই-সিরাজ আফিফ।
- ঘ. মিনহাজ-উস-সিরাজ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ হিসেবে নাসিরউদ্দীনের মূল্যায়ন করুন।
২. নাসিরউদ্দীনের শাসনামলে বলবনের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

পাঠ ৬

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৬ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলবন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমীরদের বিদ্রোহ দমনের জন্য বলবনের গৃহীত ব্যবস্থাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- তাঁর সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বলবন কর্তৃক মেওয়াটী দস্যু ও দোয়াবের বিদ্রোহী সর্দারদের দমন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বলবন কর্তৃক বাংলার বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বলবনের মোঙ্গল নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বলবনের প্রাথমিক জীবন

সুলতান নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর। তুর্কিস্তানের বিখ্যাত ইলবারী গোত্রে তাঁর জন্ম। যৌবনে একদল দস্যু তাঁকে তাঁর পরিবার থেকে লুট করে নিয়ে যায়। তিনি জামালউদ্দীন বসরীর নিকট বিক্রিত হন। তাঁর এই প্রভু ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়। তিনি তাঁকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন। এখানে তাঁর লেখাপড়ার সুব্যবস্থা হয়। পরে একদল দাসের সাথে তাঁকে দিল্লী আনা হয়। সুলতান ইলতুতমিস অন্যান্য দাসের সাথে বলবনকে কিনে নেন। নিজ যোগ্যতায় বলবন শিগগিরই সুলতানের কৃপাদৃষ্টি লাভে সক্ষম হন। তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইলতুতমিসের বিখ্যাত 'চল্লিশের' একজন হয়ে যান। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর রুকুনউদ্দীন ফিরোজ, সুলতানা রাজিয়া, বাহরাম শাহ ও আলাউদ্দীন মাসুদের সময় তিনি ছিলেন খুবই প্রভাবশালী আমীর। সুলতান নাসিরউদ্দীন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে বলবনের কন্যার সাথে সুলতানের বিয়ে হয়। তখন সুলতান রাজ্য পরিচালনার প্রায় সকল দায়িত্ব বলবনের হাতে ছেড়ে দেন। বস্তুত: বলবন প্রায় ৪০ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এর মধ্যে প্রথম বিশ বছর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং শেষ বিশ বছর ছিলেন সুলতান। তার আসল নাম ছিল বাহাউদ্দীন। বলবন ছিল তাঁর ডাক নাম। নাসিরউদ্দীন তাকে 'উলুঘ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসার সময় তিনি উপাধি গ্রহণ করেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এর মধ্যে প্রথম বিশ বছর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং শেষ বিশ বছর ছিলেন সুলতান

সিংহাসনে আরোহণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

সিংহাসনে বসেই গিয়াসউদ্দীন বলবন রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস পান। রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে সুলতান অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি রাজ্যময় এই ধারণা সৃষ্টি করেন যে, পার্থিব সকল বিষয়ে সুলতান সবার উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সুলতান হচ্ছেন ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বলিয়ান। তাঁর এই ধারণাকে আধুনিক ইউরোপের "Divine Right Monarchy"-র সাথে তুলনা করা যায়। বলবনের মতে, সুলতান হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি 'জিল্লুল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতিচ্ছবি। সুলতানের ইচ্ছাই আইন। এর প্রতিবাদ করা পাপ এবং অপরাধ, এবং তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। সুলতানের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তিনি তাঁর দরবারে পারস্যের রাজকীয় রীতিনীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর জমকালো দরবারে হাসি-ঠাট্টা তিনি একদম বন্ধ করে দেন। তিনি সব সময় রাজকীয় বেশ-ভূষায় আচ্ছাদিত থাকতেন। তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যরাও তাঁকে কখনো সাধারণ পোষাকে দেখেনি। সে যুগে তাঁর এ রীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এ রীতি প্রবর্তনের ফলে আমীরগণ ভাবতে বাধ্য হন যে, সুলতান তাঁদের সমকক্ষ তো ননই, তিনি তাঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিও নন। তিনি তাঁদের সকলের উর্ধে। সাধারণের জন্য দরবারের দরজা খোলা ছিল না। একবার তিনি যখন দরবারে উপবিষ্ট, সে অবস্থায় তাঁর প্রিয় পুত্র মুহম্মদের মোঙ্গলদের হাতে নিহত হওয়ার সংবাদ দরবারে পৌঁছে। এ সংবাদ তিনি আশ্চর্য ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করেন, একটুও চোখের পানি ফেলেন নি। এক কথায় সুলতান বলবনের

কাছে ব্যক্তি বলবনের আত্মিক্রয় ঘটেছিল। তিনি তাঁর পৌত্রদের নামও পারস্য রীতিতে কায়কোবাদ, কায়মুরস, কায়-খসরু ইত্যাদি রেখেছিলেন এবং তাঁদেরকে সেভাবেই গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি

বলবন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দিল্লী সালতানাতের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ইলতুতমিসের "চল্লিশ" আমীরের দলটি তখন অত্যন্ত বেপরোয়া। তারা কাউকে মানতে চাইতো না। এমনকি সুলতানকেও না। বলবন নিজেও এক সময় ছিলেন এই চল্লিশেরই একজন। সুতরাং তিনি তাদের মনোভাব, গতিবিধি, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সবলতা-দুর্বলতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি তাদের দমনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মালিক বরবক, হায়বৎ খান, আমিন খান প্রমুখ বিদ্রোহী বা বিপজ্জনক আমীরদের তিনি মৃত্যুদন্ড দেন। আপন চাচাত ভাই শেরখানকেও তিনি এ ব্যাপারে রেহাই দেননি। তিনি তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। সুলতানের এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে অপরাপর আমীরগণ ভয় পেয়ে যান এবং সোজা পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হন। তিনি রাজ্যব্যাপী কঠোর গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন করেন। গুপ্তচরেরা আমীরদের সকল খবরা-খবর সুলতানকে পৌঁছে দিতো। ঠিকমতো খবর দিতে না পারলে গুপ্তচরদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। সুতরাং কঠোর পুলিশি ব্যবস্থার কারণে আমীরগণ আর ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না, বিদ্রোহ করাতো দূরের কথা।

বলবন সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন

বলবন সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। ইতিপূর্বে অনেক অথর্ব, অকেজো সৈনিক এমনকি মৃত সৈনিকের আত্মীয়-স্বজন জায়গীর ভোগ করতো। এতে রাষ্ট্রের আয় যেমন কমে গিয়েছিল, সৈন্যবাহিনীর দক্ষতাও তেমনি হ্রাস পেয়েছিল। বলবন এই অপচয় রোধ করেন। তিনি একটি দক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং উন্নত সমরাস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেন। তিনি অনেক নতুন দুর্গ স্থাপন এবং পুরনো দুর্গগুলো সংস্কার করেন।

দস্যুতা দমন

পূর্ববর্তী দুর্বল সুলতানদের শাসনামলে মেওয়াট অঞ্চলে দস্যুদের উৎপাত অত্যন্ত বেড়ে যায়। তারা রাজ্যময় অশান্তি সৃষ্টি করে। তাদের অত্যাচার এতটাই বেড়ে যায় যে, আসরের নামাজের পরপরই দিল্লীর পশ্চিম দরজা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হতো। প্রজাদের জানমাল রক্ষার জন্য বলবন মেওয়াটী দস্যুদের দমনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনেক দস্যুকে ধরে হত্যা করা হয়। লুটপাট করে দস্যুগণ যে সকল জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতো তিনি সে জঙ্গলগুলো পর্যন্ত সাফ করে ফেলেন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেন। এভাবে মেওয়াটী দস্যুদের সৃষ্ট অরাজকতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু প্রধানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সুলতান তাদেরকে কঠোরহাতে দমন করেন। এভাবে দেশে পুনরায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

বাংলার বিদ্রোহ দমন

বলবন রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত। এই সুযোগে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খান ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে নামধারণ করেন "সুলতান মুঘিসউদ্দীন"। তাঁর নামে মুদ্রা চালু ও খুৎবা পাঠ করা শুরু হয়। তাঁকে দমন করার জন্য সুলতান একটি অভিযান পাঠান। আমির খান ছিলেন এই অভিযানের নেতা। আমির খান ব্যর্থ হন। ক্রুদ্ধ সুলতান তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেন। এরপর সুলতান আর একটা অভিযান পাঠান। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মালিক তুঘ্রিলকে। কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। এরপর সুলতান নিজেই তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান সাথে নিয়ে আসেন তাঁর ছোট ছেলে বুগরা খানকে। তুঘ্রিল খান রাজধানী অরক্ষিত রেখেই জাজনগরের (উড়িষ্যার) দিকে পলায়ন করেন। লখনৌতি দখল করে বলবন তাঁর পেছনে সৈন্য পাঠান। তুঘ্রিল ধরা পড়েন। তাঁকে শিরচ্ছেদ করা হয়। তাঁর অনুচরদের গাছে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বলবন রাজধানীতে ফিরে যান। ফেরার আগে তিনি পুত্র বুগরা খানকে বিদ্রোহের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

বলবনের মোঙ্গল নীতি

বলবন মোঙ্গলদের সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি পশ্চিম সীমান্তের দুর্গগুলো সংস্কার করেন। এসকল দুর্গে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, উপযুক্ত রসদ এবং প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র মোতায়েন করা হয়। সুলতানের চাচাত ভাই শেরখান সুলতান ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শেরখান মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য তাঁকে হত্যা করার পর সুলতানের বড় ছেলে শাহজাদা মুহম্মদকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। ছোট ছেলে শাহজাদা বুগরা খানকে নিযুক্ত করা হয় সামানা ও সুসানের শাসনকর্তা। তাঁরা দু'ভাই সুলতানের আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেন। তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করেন। বলবন নিজেও সব সময় সতর্ক থাকতেন। তাঁর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজ্য বিজয়ে বের হতেন না। সাম্রাজ্য রক্ষা করার উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের একটা দল পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে। দিল্লী থেকে মালিক মুবারককে দুই শাহজাদার সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। তাঁরা সাফল্যের সাথে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলগণ আবার পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে। শাহজাদা মুহম্মদ এই অভিযানও প্রতিহত করেন। তবে তিনি নিজে এই দায়িত্ব পালনের সময় শহীদ হন।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে বলবন মনে প্রচন্ড আঘাত পান। এই সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর। এরপর তিনি আর বেশীদিন বাঁচেননি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছোট ছেলে বুগরা খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুগরা খান বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিরুপদ্রব জীবন-যাপন করাই অধিকতর পছন্দ করেন। তখন সুলতান শাহজাদা মুহম্মদের পুত্র কায়খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সার-সংক্ষেপ

সুলতান নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সুলতান হন। তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তিনি উদ্ধত আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করেন। মেওয়াটী দস্যুদের সমূলে ধ্বংস করে তিনি প্রজাদের জান-মাল রক্ষা করেন। বিদ্রোহী হিন্দু প্রধানদের দমন করে তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘ্রিলকে তিনি দমন করেন। বহু অনুচরসহ তুঘ্রিলকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। বলবন একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি পশ্চিম সীমান্তে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। এসকল দুর্গে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তিনি রাজ্যজয় অপেক্ষা রাজ্যের সংহতি বিধানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। দীর্ঘদিন তিনি সফলভাবে শাসন করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৬

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১। সিংহাসনে বসার সময় বলবনের বয়স ছিল–
   ক. প্রায় ৪৫ বছর।
   খ. প্রায় ৫০ বছর।
   গ. প্রায় ৫৫ বছর।
   ঘ. প্রায় ৬০ বছর।

২। বিদ্রোহী শেরখানকে বলবন শাস্তি দেন তা হচ্ছে–
   ক. বিষ প্রয়োগে হত্যা।
   খ. শিরচ্ছেদ।
   গ. ফাঁসি।
   ঘ. নির্বাসন।

৩। বিদ্রোহী তুঘ্রিলকে দেয়া শাস্তি ছিল–
ক. বিষ প্রয়োগে হত্যা।
খ. শিরচ্ছেদ।
গ. ফাঁসি।
ঘ. নির্বাসন।

৪। বলবন তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন–
ক. বুগরা খানকে।
খ. কায়কোবাদকে।
গ. কায়মুরস্‌কে।
ঘ. কায় খসরুকে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলবন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. বলবনের সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. বলবন কর্তৃক মেওয়াটী দস্যু ও বিদ্রোহী হিন্দু সর্দারদের দমন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৪. বলবন কর্তৃক বাংলার বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৫. বলবনের মোঙ্গল নীতি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৭

বলবনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- শাসক হিসেবে বলবনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- মানুষ হিসেবে বলবনের চরিত্র নিরূপণ করতে পারবেন।

শাসক হিসেবে বলবন

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কী সালতানাতের শ্রেষ্ঠ সংগঠক। কুতুবউদ্দীন আইবেক এই সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন, ইলতুতমিস ছিলেন এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, আর গিয়াসউদ্দীন বলবন এর সংহতি বিধান করেন। তিনি প্রায় বিশ বছর সুলতান ছিলেন। সুলতান হওয়ার আগেও তাঁর জামাতা নাসিরউদ্দীনের শাসনামলে তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক। তাই প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর শাসন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের সামান্য বেশি। সুতরাং জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে অত্যন্ত দুরূহ কাজ তিনি অপূর্ব দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে গেছেন। এই চল্লিশ বছর দিল্লী সালতানাতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে মুসলমান শাসন বলতে গেলে তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। মুসলমান শাসনের বুনিয়াদ তখনো তেমন শক্ত হয়নি। চতুর্দিকে বিদ্রোহ। অশান্ত শত্রু দ্বারা সালতানাত পরিবেষ্টিত। আমীরগণ উদ্ধত, বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল। কোন কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিদ্রোহী। মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায়। সৈন্যবাহিনীও সুসংগঠিত নয়। এমতাবস্থায় বলবন শাসনক্ষমতায় এসে এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেন। এটি একদিকে যেমন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে, অপরদিকে তেমনি শাসক হিসেবে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে।

সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন, তাই তাঁকে ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে। তিনি বিদ্রোহী আমীরদের দমন করেন। তাঁদের চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মেওয়াটী দস্যুদের দমনের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য তৎপরতা ও দৃঢ়তা দেখান। সমস্যা সমাধানে বলবন ছিলেন আন্তরিক। প্রজার জান-মাল রক্ষায় তিনি ছিলেন আপোসহীন। হিন্দু প্রধানদের সাথেও তিনি কোন প্রকার আপোস-মীমাংসা করেন নি। তাদের সকল প্রতিরোধ ও চক্রান্ত ধ্বংস করে তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারেও আমরা তাঁর ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তা লক্ষ করি। পর পর দুটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই সে দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। অথচ, সুলতানের বয়স তখন ছিল প্রায় আশি বছর। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা তাঁর প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। তুঘ্রিল ও তাঁর অনুচরদের কঠোর দন্ড দিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। মোঙ্গলদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের পুত্রদের তিনি এজন্য পশ্চিম সীমান্তের বিপজ্জনক ঘাঁটিসমূহে নিয়োজিত করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে বলবন কতোটা সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও সকল সময় প্রস্তুত থাকতেন। এ জন্য শক্তিশালী ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো রাজ্য বিজয়ে বের হননি। এরকম বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন দূরদর্শী শাসক বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মুহম্মদ ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। দরবারের সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে এরকম পুত্রকে তাঁর হারাতে হয়েছিল। শাসক হিসেবে বলবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ড: আজিজ আহমদ বলেন, "গোলযোগ ও আসন্ন বিপদের মধ্য থেকে বলবন সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন। প্রজারা তাঁর নতুন শাসনকে হৃষ্টচিত্তে বরণ করে নিয়েছিল।"

সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন, তাই তাঁকে ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে

মানুষ হিসেবে বলবনের চরিত্র

বলবন ন্যায় বিচারক ছিলেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, আমীর-ফকিরে কোন ভেদাভেদ করতেন না। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান দৃষ্টি। ভৃত্য কিংবা গরিব ক্ষেতমজুরের উপর অত্যাচারের কারণে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা প্রভাবশালী আমীরকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি গুণীজনের সমাদর করতেন। ভারতের তোতাপাখী নামে পরিচিত কবি আমীর খসরু

সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মোঙ্গল আক্রমণের কারণে মধ্য এশিয়ার বহু গুণীজন ও রাজ্যহারা রাজা ভারতে এসে সুলতানের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলবন ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। সারাদিন কাজ করেও তিনি ক্লান্ত হতেন না। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নামাজ-রোজা করতেন। বদাউনী বলেন যে, সুলতান কখনো বিনা অযুতে থাকতেন না। বলবনের ধৈর্য ছিল অসাধারণ। তিনি মানসিক স্থৈর্য সাধারণের সামনে কখনো হারতেন না। প্রিয় পুত্র মুহম্মদের মৃত্যুর খবর যখন তাঁর নিকট পৌঁছে তখন তিনি দরবারে উপবিষ্ট। আশ্চর্য স্থিরতার সাথে এই নিদারুণ সংবাদ তিনি গ্রহণ করেন। একটুও ভেঙ্গে পড়েন নি। সম্ভবত: এরকম মানসিক শক্তি শুধুমাত্র বলবনের বেলাতেই সম্ভব। বলবনের চরিত্র আমাদেরকে শুধু আকৃষ্টই করে না, অভিভূতও করে।

সার-সংক্ষেপ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ শাসক। তিনি দিল্লীর প্রাথমিক তুর্কী সালতানাতের সংহতি সাধন করেন। আমীরদের চক্রান্ত, মেওয়াটী দস্যুদের লুটতরাজ, হিন্দু প্রধানদের এবং তুঘ্রিল খানের বিদ্রোহ তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। তিনি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটিগুলো তিনি সুরক্ষিত করেন। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর ধৈর্য ছিল অসাধারণ। তিনি জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দিল্লীর প্রাথমিক সালতানাতের সংহতি বিধান করেন–
ক. কুতুবউদ্দীন আইবেক।
খ. ইলতুতমিস।
গ. নাসিরউদ্দনি মাহমুদ।
ঘ. গিয়াসউদ্দীন বলবন।

২। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বলবনের যে নিকট আত্মীয় নিহত হন তিনি হচ্ছেন–
ক. মুহম্মদ।
খ. বুগরা খান।
গ. শেরখান।
ঘ. কায়কোবাদ।

৩। "ভারতের তোতা পাখী" নামে পরিচিত কবি–
ক. ফেরদৌসী।
খ. আমীর খসরু।
গ. আলাওল।
ঘ. মালিক মুহম্মদ জয়সী।

৪। বলবন কখনো বিনা ওজুতে থাকতেন না-এ তথ্য আমরা যে ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানতে পারি, তিনি হচ্ছেন–
ক. মিনহাজ-উস-সিরাজ।
খ. আল-বিরুনী।
গ. বদাউনী।
ঘ. আবুল ফজল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শাসক হিসেবে বলবনের মূল্যায়ন করুন।
২. বলবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ৯ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুতুবউদ্দীন আইবেকের প্রাথমিক জীবন আলোচনা করে শাসক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করুন।
২. ইলতুতমিসের সিংহাসনারোহণের ঘটনা এবং শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৩. সুলতানা রাজিয়ার বিরুদ্ধে আমীরদের বিদ্রোহের কারণ কি ছিল? রাজিয়া কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন আলোচনা করুন।
৪. শাসক ও মানুষ হিসেবে নাসিরুদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন এবং তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
৬. শাসক ও মানুষ হিসেবে বলবনের কৃতিত্ব ও চরিত্র নিরূপণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৯.১	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ৯.২	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ৯.৩	ঃ	১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. খ
পাঠ ৯.৪	ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ৯.৫	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ৯.৬	ঃ	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. খ
পাঠ ৯.৭	ঃ	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. ক

সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তার